৮.১.৩ মার্টিন লুথার ও সংস্কারবাদী আন্দোলন

জার্মানির সংস্কার আন্দোলনে এই বৈশিষ্ট্যগুলি স্পষ্ট দেখা যায়। জার্মানিতে সংস্কার আন্দোলনের প্রাথমিক প্রকাশের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বব স্ক্রিবনারের যে বক্তব্য আমরা উল্লেখ করেছি, তা জার্মানির সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় জীবনের সম্পর্ক চিহ্নিত করে। জার্মানির রাজন্যবর্গের সমর্থন এবং তাদের যাজক সম্প্রদায়কে নিয়ন্ত্রণ করার যে প্রচেষ্টা, তা লুথারপন্থীদের নিঃসন্দেহে অনেকটা সাহায্য করেছিল। কিন্তু শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সংস্কার আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্বকে বিশ্লেষণ করা যায় না। পঞ্চদশ শতকের শেষ থেকে জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মানবতাবাদী পণ্ডিতদের সমাবেশ ঘটছিল। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রসংখ্যা তো বাড়ছিলই, সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষারও যথেষ্ট প্রসার হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সীমিত চৌহদ্দি থেকে নতুন চিন্তাধারা সমাজের অন্যান্য স্তরে পৌঁছচ্ছিল। ফলে ধর্মীয় জীবনে সংস্কারের আবশ্যিকতা সম্পর্কে জার্মানির শিক্ষিত সমাজে একটা প্রত্যয়ী চেতনা আমরা লক্ষ করি। ফলে ১৫২০-র দশকে লুথারের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে যে আলোড়ন সৃষ্টি হল, তা নগরের শিক্ষিত মানুষের সমর্থন খুব সহজেই পেয়েছিল। লুথার বললেন ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্মবিশ্বাসী মানুষের কোনো মধ্যবর্তীর প্রয়োজন নেই। একজন ব্যক্তি নিজেই

ধর্ম, ... নিজের পুরোহিত। এই বক্তব্যের একটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ব্যঞ্জনা আছে। ষোড়শ শতকে যাজকতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই বক্তব্য ছিল একটি সরাসরি আক্রমণ। Indulgence বা মার্জনাপত্রকে ধিক্কার দিতে গিয়ে লুথার বললেন স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য কোনো দান-ধ্যান, আচার-অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নেই। বরং করুণাময় ঈশ্বরের ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখলেই মানুষের মুক্তি সম্ভব। লুথারবাদের এই দুই মূল বক্তব্য সংস্কারবাদী ধর্মতত্ত্বের কেন্দ্রে অবস্থান করছে।

জার্মানিতে যে আন্দোলনের সূত্রপাত, তার প্রভাব দেখা যায় জার্মানি সংলগ্ন জার্মান ভাষাভাষী অঞ্চলে। সুইৎজারল্যান্ড এবং অস্ট্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তা বিস্তৃত হয়েছিল নেদারল্যান্ডে ও পরে পশ্চিম ও দক্ষিণ ইউরোপে। এই প্রতিবাদী মতবাদের প্রসারের প্রধান মাধ্যম ছিল সংস্কারপন্থীদের লেখা নানা ধরনের বই। এই বইগুলি সংস্কারবাদী ভাবনার গ্রহণযোগ্যতা অবশ্যই বাড়িয়েছিল। তথাপি স্থানভেদে আন্দোলনের গতি ও সাফল্যের তারতম্য ঘটেছিল। এর সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করেছে আঞ্চলিক রাজশক্তির সঙ্গে সংস্কারবাদী যাজকদের সম্পর্কের ওপর। জার্মানিতে ধর্মসংস্কার ঘটেছিল দ্রুত লয়ে। ইংল্যান্ড বা স্কটল্যান্ড বা সুইডেন ও নরওয়ের মতো দেশে প্রথম পর্যায়ে সংস্কার আন্দোলন এগিয়েছিল ঢিমে তালে। পরে রাজশক্তির আনুকূল্যে সংস্কার আন্দোলন অনেকটা সফল হয়েছিল। ফলে অনেকেই বিশেষত ক্যাথলিকবাদের প্রতি অনুরাগী পণ্ডিতেরা বলেছেন যে এইসব ক্ষেত্রে ধর্মসংস্কার রাষ্ট্রের উদ্যোগে সাধারণ মানুষের ওপর আরোপিত হয়েছিল। সংস্কারপন্থী ধর্মীয় চেতনা কতটা স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য সৃষ্টি করেছিল তা নিয়ে সংশয় আছে। এমনটা ঘটেনি বলেই ফ্রান্স ও নেদারল্যান্ডে সংস্কারপন্থা অন্তর্বিরোধ সৃষ্টি করে। বিশেষত যেখানে রাজশক্তির এ ব্যাপারে একটা বিরোধী অবস্থান ছিল। ইতালি কিংবা স্পেনে চার্চ সংস্কারবাদকে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করেছিল।

সংস্কার আন্দোলনের এই আঞ্চলিক বিভিন্নতার প্রেক্ষিতে স্থানীয় বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ সাম্প্রতিক ইতিহাসচর্চার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। ধর্মসংস্কারের ঐতিহাসিক জার্মানিতে উদ্ভূত লুথারপন্থী প্রতিবাদী ধর্মীয় চেতনা প্রতিবাদী ধর্মযাজক ও রাজশক্তির যুগ্ম প্রয়াসে কীভাবে ইউরোপের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ল এই একমাত্রিক ইতিহাসের পরিবর্তে বহুমাত্রিকতার সন্ধান করেছেন। ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলের রাজনৈতিক অবস্থা এবং সামাজিক বিক্ষোভের সঙ্গে যেভাবে ধর্মসংস্কারের প্রেরণা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়েছিল, সে সম্পর্কে আমরা যত সচেতন হয়েছি, তত আমাদের ঐতিহাসিক মনন সমৃদ্ধ হয়েছে। জার্মানিতে ১৫১৭ সালে লুথার যখন Indulgence-গুলিকে আক্রমণ করলেন, তা যাজক শ্রেণির মধ্যে যে বিতর্কের সূত্রপাত করেছিল, তাকে দুটি ধর্মীয় মতাদর্শের সংঘাত বলে মনে করা যেতে পারে, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই এই সংঘাত রাজনৈতিক আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল নানা স্তরে। ১৫২৩-এর পর থেকে প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর এই আঘাত এমন একটি বিদ্রোহী বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল যেখানে জার্মানির উত্তরাঞ্চলের কৃষিজীবী মানুষ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, শুধুমাত্র

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নয়। সামাজিক নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে এই কৃষক বিদ্রোহ রাজশক্তিকে উদ্বিগ্ন করেছিল। ভূস্বামী শ্রেণি আক্রান্ত হলে পরে আঞ্চলিক রাজশক্তি এই বিদ্রোহ দমনে উদ্যোগী হয়। ১৫২৫-এ এই বিদ্রোহ দমন করা হল। এর পর জার্মানির সংস্কার আন্দোলনের ওপর রাজকীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হল। রাজন্যবর্গের আনুকূল্যে লুথার প্রতিবাদী ধর্মীয় সংগঠন গড়ে তুললেন এবং এই নতুন ধর্মীয় সংগঠন গণবিদ্রোহ ও সামাজিক আলোড়নের পটভূমিতে ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ নতুন করে প্রতিষ্ঠা করতে অগ্রণী হল, যাতে সমাজে স্থিতিশীলতা ফিরে আসে। এইভাবে জার্মানির এই অঞ্চলগুলিতে লুথারপন্থী ধর্মমত রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি পেলে ইউরোপে একটি ধর্মকেন্দ্রিক রাজনৈতিক বিভাজনের সৃষ্টি করে। একদিকে ছিল প্রতিবাদী মতের অনুগামী রাজন্যবর্গ, অন্যদিকে ক্যাথলিক ধর্মের ধারক রোমের পোপ এবং হোলি রোমান সাম্রাজ্য। যেভাবে লুথারবাদ পোপ এবং সম্রাটের বহুজাতিক, রাজনৈতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে আঞ্চলিক রাজশক্তিকে সংগঠিত করেছিল, তার ফলে প্রতিবাদী ধর্মমত জাতীয় রাজতন্ত্রের উত্থানের পথ প্রশস্ত করে। ধর্মসংস্কারের এক ধরনের সার্বজনীন চরিত্র অবশ্যই ছিল। ইউরোপের অন্য অঞ্চলের ক্ষেত্রেও এই কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। তথাপি জার্মানিতে কেন এই ধর্মীয় প্রতিবাদ প্রথমে সংঘটিত হয়েছে, তা নিয়ে অনেকে বিশ্লেষণ করেছেন। বব স্ক্রিবনার দেখাচ্ছেন যে জার্মানিতে কেন্দ্রীয় রাজশক্তির অনুপস্থিতি এবং হোলি রোমান সাম্রাজ্যের দুর্বলতা সংস্কার আন্দোলনের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। জার্মানির রাজন্যবর্গ সম্রাটের আধিপত্য মানতে নারাজ ছিল। হ্যাপসবার্গ বংশের সঙ্গে তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। এছাড়া জার্মানির ধর্মীয় সংগঠনে বেশ কিছুদিন ধরেই রাজশক্তি তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। চার্চের নিয়োগ তাঁরা নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেন, ফলে পোপের সঙ্গে তাঁদের বিরোধিতা অবশ্যাম্ভাবী ছিল। এই পোপ-বিরোধী অবস্থানের সঙ্গে জুড়ে ছিল হ্যাপসবার্গ রাজবংশের জার্মানিতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে জার্মানির রাজশক্তির প্রতিরোধ। এই বিরাট রাজনৈতিক পটভূমিতেই লুথারের সংস্কারের প্রয়াসকে ব্যাখ্যা করতে হবে।

তাঁর সংস্কারপন্থী মতাদর্শের কেন্দ্রে ছিল দুটি তত্ত্ব — সবাই নিজের পুরোহিত এবং ঈশ্বর বিশ্বাসই মুক্তির একমাত্র পথ (Priesthood of all believers and Justification by Faith)। এই লুথারবাদী ধর্মতত্ত্বের উৎস কি, তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানান বিতর্ক আছে। সাম্প্রতিক কালের অনেক লেখায় লুথারকে একজন মানবতাবাদী দার্শনিক হিসেবে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা লক্ষণীয়। ভিটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক হিসেবে তিনি যে বক্তৃতা দিতেন এবং যেভাবে তাঁর সমসাময়িক মানবতাবাদী পণ্ডিতদের পুঁথি বিশ্লেষণের পদ্ধতি অনুসরণ করে বিদ্যাচর্চায় মগ্ন ছিলেন, তার ভিত্তিতে তাঁকে একজন মানবতাবাদী দার্শনিক হিসেবে চিন্তা করার মধ্যে কোনো ভ্রান্তি নেই। অন্য অনেক মানবতাবাদী পণ্ডিতের মতনই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সনাতন পঠন-পাঠন সম্পর্কে সমালোচনা করতেন। শিক্ষাবিস্তারের ওপর তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দেন, যাতে

মানুষের আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি পায়। এতদ্‌সত্ত্বেও মনে রাখা প্রয়োজন যে লুথার একজন অত্যন্ত ধর্মবিশ্বাসী মানুষ ছিলেন। তাঁর চরিত্রে যথেষ্ট জটিলতা ছিল। জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি লুথারের ধর্মবিশ্বাসী মন তাঁর চরিত্রে বিচিত্র ধরনের স্ববিরোধী প্রবণতা সৃষ্টি করেছিল। তাঁর মনে হত মন্দ প্রেতাত্মারা তাঁর চারদিকে ঘুরে বেড়ায় এবং মানুষকে সতত কুপথে পরিচালিত করে। এক অন্তহীন পাপবোধ তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করেছিল। কথিত আছে, কোনো একদিন বজ্রপাতের সময় সন্ত্রস্ত হয়ে তিনি যাজকবৃত্তি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন। পরে যাজক হিসাবে তিনি যে জ্ঞান অর্জন করেন, তার ভিত্তিতে তিনি প্রথমে এরফুট বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পরে ভিটেনবার্গে অধ্যাপনায় মনোনিবেশ করেন।

দৈব ও মানবজীবন সম্পর্কে এই পরস্পরবিরোধী ভাবনা লুথারের ধর্মতত্ত্বে প্রোথিত ছিল। একদিকে ধর্মবিশ্বাসী লুথার মনে করতেন যে মানুষের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য হল ঈশ্বরের অনুগমন করা এবং অন্যদিকে তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, মানুষ এমন একটা জগতের অধিবাসী, যেখানে তার জীবনের প্রয়োজনে সে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন। জীবনকে সংগঠিত করতে মানুষ নির্ভর করে যুক্তির ওপর, আর অন্যদিকে তাঁর জীবনে ঈশ্বরের উপস্থিতি মানুষ সবসময় যুক্তি দিয়ে বোঝে না, সেটা উপলব্ধির ক্ষেত্র। মানুষের অস্তিত্বের একদিকে রয়েছে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, অন্যদিকে বিশ্বাসের জগত। এরফুর্টে অধ্যাপনা করার সময় তিনি Occamism-এর বিশ্লেষণ করতেন, যে দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য ছিল ঈশ্বর ও মানবের এই বিচ্ছিন্ন অবস্থান।

লুথারের ধর্মতত্ত্ব এই বিচ্ছিন্নতা দূর করতে চেয়েছিল। মানুষের এই ঈশ্বর-বিচ্ছিন্ন অবস্থান লুথারকে সন্ত্রস্ত করেছিল এবং এই ভীতি থেকে মুক্তির তাগিদে তিনি ঈশ্বর এবং মানবের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে ভাবতে শুরু করেন। তাঁর নিজের মতন করে যখন তিনি এই সমস্যার সমাধান করলেন, সেখানে ভক্তের আকুতির পরিবর্তে অনেক বেশি প্রভাবশালী ছিল একজন পণ্ডিতের মনন। লুথার তখন ভিটেনবার্গে সেন্টপলের বাণীর ওপর বক্তৃতা দিতেন। সেই প্রসঙ্গে Occamism-এর বিরোধিতা করে তিনি বলতেন ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে চলে ঈশ্বরে বিশ্বাস। করুণাময় ঈশ্বরের প্রতি নিঃসংশয় চিত্তে বিশ্বাসী থাকলেই মানুষের মুক্তি সম্ভব। সংস্কার আন্দোলনের ভিত্তি প্রস্তুত করেছিল এই তত্ত্ব। ঈশ্বরের করুণায় বিশ্বাসী হলে যদি মুক্তি লাভ হয়, তাহলে সেই মুক্তি প্রাপ্তির আশায় কোনো ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া অর্থহীন। যেহেতু ঈশ্বরের বাণীই হল এই বিশ্বাসের উৎস, তাই বাইবেলের বাণী প্রচারের মাধ্যমেই এই বিশ্বাস জাগ্রত করা সম্ভব।

এ জাতীয় ধর্মতত্ত্বের প্রেক্ষিতে লুথার যখন তৎকালীন ধর্মীয় জীবনের মূল্যায়ন করেছিলেন, সংগত কারণেই তাঁর মনে হয়েছিল যে খ্রিস্টধর্মাবলম্বীরা বাইবেলে যে ধর্মীয় জীবনের উল্লেখ রয়েছে তার থেকে বিচ্যুত হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লুথার লিখেছিলেন তাঁর Ninety Five Thesis ; উদ্দেশ্য ছিল রোমান ক্যাথলিক যাজকদের সঙ্গে সদ্‌ধর্মের চরিত্র কি, সেই প্রসঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়া। ১৫১৯ সালে লাইপজিগে

জোহেনেস এক (Johannes Ecke) নামে একজন রক্ষণশীল ধর্মযাজকদের সঙ্গে বি যে বিতর্কে অংশ নেন, তার মধ্য দিয়ে তিনি পোপতন্ত্র সম্পর্কে নানান প্রশ্ন তোলেন পোপতন্ত্র ঈশ্বরের সৃষ্টি এই প্রচলিত মত তিনি খণ্ডন করলেন। এই প্রসঙ্গে ও ওয়াইক্লিফ এবং জন হাসের মতবাদের সঙ্গে লুথারের বক্তব্যের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে এই বক্তব্যের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল আরেকটি বৈপ্লবিক মতবাদ। লুথার বিশ্বাস করতেন ভাল কাজ করলেই ঈশ্বরের করুণা পাওয়া যায় না, তার আগে ভাল মানুষ হতে হয়। একজন ভাল মানুষের মুক্তির জন্য কিংবা ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য কোনো মধ্যবর্তীর প্রয়োজন নেই, সে নিজেই নিজের পুরোহিত। মার্জনাপত্র কিনে মুক্তির সন্ধান অপ্রয়োজনীয়। লুথারের এই তত্ত্ব মধ্যযুগীয় খ্রিস্টধর্মচর্যার মৌলিক আচার-অনুষ্ঠানের ওপর আক্রমণ হেনেছিল এবং কালক্রমে তাঁর অনুগামী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু মেলাংকথন (Melanchthon)-এর প্রচেষ্টায় এই তত্ত্ব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

১৫২০ সালে লুথার তিনটি প্রচার পুস্তিকা লেখেন, যার মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল Babylonish Captivity of the Church। এই পুস্তিকায় তিনি পুরোহিততন্ত্রের অবসানের কথা বলেন। ধর্মীয় জীবনের মূল কথা হল ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস সমৃদ্ধ হয় ঈশ্বরের বাণী জানলে পরে। যেকোনো মানুষের পক্ষেই এই ধর্মজ্ঞান অর্জন করা সম্ভব। লুথার একটি বিকল্প ধর্মীয় সংগঠনের কথা ভেবেছিলেন, যে ধর্মীয় সংগঠন যাজকতন্ত্রকে বর্জন করে ধর্মবিশ্বাসী মানুষের সমাবেশ হিসেবে গড়ে উঠবে।

এই নতুন ধর্মতত্ত্ব মধ্যযুগের চার্চের সাংগঠনিক কাঠামোকে সরাসরি আঘাত করেছিল। যদিও সাধারণ মানুষের ধর্মীয় জীবনে পুরোনো আচার-অনুষ্ঠান পুরোপুরি বর্জন করা হয়েছিল, তা নয়, কিন্তু এই ধর্মতত্ত্ব রাষ্ট্র এবং চার্চের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা বড় ধরনের পরিবর্তনের সূত্রপাত করেছিল। রাষ্ট্রবাদী যাজকদের পথ অনুসরণ করে লুথার বলেন যে একটি দুর্নীতিগ্রস্ত ধর্মীয় সংগঠনকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার রাজার আছে। কারণ আঞ্চলিক রাজশক্তির সহায়তা ছাড়া নতুন করে চার্চকে সংগঠিত করা সম্ভব ছিল না। মধ্যযুগেও অনেকেই রাজশক্তির এই নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা স্বীকার করে নিয়েছিল। একই কারণে ওয়াইক্লিফ ইংল্যান্ডের রাজার কাছে আবেদন করেছেন। চার্চকে দূষণমুক্ত করার তাগিদে লুথার ১৫২০ সালে আরেকটি যে গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকা লেখেন, তাতে এই রাষ্ট্রবাদী মতাদর্শ প্রচারিত হয়েছিল, তাঁর 'Appeal to the christian nobility of the German nation' জার্মানির রাজন্যবর্গকে আহ্বান করেছিলেন, যাতে রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিপুল বৈভব, সম্পদ ও রাজকীয় ক্ষমতা ধ্বংস করা যায়। এগুলি ধ্বংস না হলে লুথারের মনে হয়েছিল সদ্‌ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। তিনি বলেন চার্চের মধ্যে সদ্‌ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা হল ঈশ্বর বিশ্বাসী রাজশক্তির অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

এই সদ্‌ধর্মের প্রকৃতি কি এবং এক্ষেত্রে একজন ঈশ্বর বিশ্বাসী মানুষের অবস্থান কোথায়, এই প্রশ্নের উত্তর মেলে তাঁর তৃতীয় পুস্তিকা 'Concerning the liberty of a christian man'-এ। স্বাধীনভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাসী থেকে ধর্মপালন একজন

খ্রিস্ট-ধর্মাবলম্বীর স্বাভাবিক অধিকার। এর জন্য মানুষকে সামাজিক ক্ষেত্রে ভাল কাজ করে ঈশ্বর বিশ্বাস প্রচার করতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ঈশ্বর বিশ্বাসই ছিল লুথারবাদের মূল কথা এবং এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে তাঁর সঙ্গে ইরাসমাসের তীব্র মতপার্থক্য হয়। ইরাসমাস যেভাবে সদ্‌ধর্মকে মানবচেতনার অভিব্যক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন, লুথার ১৫২৫ সালে তাঁর 'Bondage of the Will' প্রবন্ধে তার সমালোচনা করেন। একদিকে মানবচরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে এক অন্তহীন পাপবোধের উল্লেখ করেছেন, অন্যদিকে ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলে পাপীরও মুক্তি সম্ভব, এই আশার বাণী সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করেছিল। সংস্কারবাদী ধর্মতত্ত্বের কেন্দ্রে ছিল এই মুক্তির আশ্বাস, যা সাধারণ মানুষের জীবনে নতুন প্রেরণা জুগিয়েছিল। তারা তাদের মতো করে লুথারবাদকে গ্রহণ করেছিল এবং এমন ধরনের ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হয়েছিল, যা লুথার নিজে কখনো অনুমোদন করেননি।